Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা : ব্রিটিশ যুগ

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হাবিব আর রহমান
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.2
Pages	১৭-২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা : ব্রিটিশ যুগ

Check for updates

হাবিব আর রহমান*

ব্রিটিশ শাসনসূত্রে পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজে এক নতুন চেতনার জাগরণ ঘটতে থাকে। এরই উদ্ভাসন লক্ষ করা যায় নবজাগ্রত এই সমাজের নানামুখী কর্মকাণ্ডে। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিবেশী যে আরেকটি বড় সমাজ বাংলায় অস্তিত্বমান, সেই মুসলমান সমাজে ওই নববিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে অনুরূপ চেতনার জাগরণ তখন ঘটেনি। শতকের শেষ দিক থেকে ক্ষুদ্রাকারে হলেও মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে। তাদের সক্রিয়তার প্রকাশ লক্ষ করা যায় সংঘ-সমিতি গঠন, সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি কর্মপ্রয়াসে। বিশ শতকের শুরু থেকে এই প্রয়াসে যথেষ্ট গতি লক্ষ করা যায় এবং হিন্দু সমাজের প্রায় অনুরূপ ঘটনা মুসলিম সমাজেও ঘটতে থাকে।

'প্রায় অনুরূপ' বলার কারণ আছে। খুব দ্রুত একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ধর্মগত কারণে হিন্দু সমাজকে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা মুসলমানদের হয়নি। যেমন বিধবা বিয়ে। ইসলাম ধর্মে বিধবা বিয়ে স্বীকৃত। এই ধর্মের প্রবর্তক নিজেই বিধবা বিয়ে করেছিলেন। তবে বাংলায় ওই সময়ে আশরাফ বা উঁচু শ্রেণির মুসলিম পরিবারে এই ধরনের বিয়ের বিশেষ চল ছিল না; এটা শরাফতির জন্য অমর্যাদাকর বিবেচনার কারণে। শ্রেণিবিশেষের এই সমস্যাটি ছিল একান্তভাবে সামাজিক, ধর্মীয় নয়।

দ্বিতীয়ত উনিশ শতকের হিন্দু চিন্তকদের লেখাপত্রে মুসলিম-প্রসঙ্গ এসেছে খুব কম। কারণ হয়ত এই যে, মুসলমানদের নিয়ে ভাববার মতো পরিস্থিতি তখনো সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাদের সমকালীন ইতিহাসের অঙ্গনে পা ফেলেই বোঝেন যে, পাশাপাশি বসবাসরত দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক তেমন প্রীতিকর নয়। সময় যত এগিয়েছে প্রীতিহীনতা তত বেড়েছে। ফলে মুসলিম লেখকদের দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিষয়টিতে বারবার দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে। বোঝা যায় দুই সম্প্রদায়ের জাগরণের মধ্যে কালগত একটা ব্যবধানও ছিল। পার্থক্য রয়েছে আরও কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। কোনো আগ্রহী গবেষক এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে।

নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি প্রমুখ যাঁরা স্বসম্প্রদায়কে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁরা তা করেছিলেন চাকরি-বাকরি ইত্যাদি বস্তুগত সুবিধাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে। পাশ্চাত্য বিদ্যার অন্তর্নিহিত চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা তাঁরা দেননি। (দ্র. বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ৫৭-৬১] তাহলেও বাস্তবে যা ঘটে, যে-কোনো বিদ্যার — বিশেষত মনের বন্ধ জানালায় ঝাঁপটা

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মারার ক্ষমতা থাকে যে-বিদ্যার — তার প্রভাব শিক্ষার্থীর চেতনায় কোনো-না-কোনোভাবে পড়েই। তাছাড়া সামনে দৃষ্টান্ত ছিল প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ। এই সমাজের অনেকে ইংরেজি বিদ্যা শিখে জীবনের নানা ক্ষেত্রে শনৈশনৈ উন্নতি করে চলেছে। কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে ছিল। এদের অনেকেই অনুধাবন করেছিলেন, যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার পথ গ্রহণ ছাড়া জীবনোন্নয়নের অন্য কোনো প্রকৃষ্ট উপায় নেই।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মুসলিম-সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের পটভূমি নির্মাণে এর একটা ভূমিকা আছে। পাক্ষিক *আহমদী* (১৮৮৬), মাসিক *হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী* (১৮৮৭), সাপ্তাহিক *মিহির ও সুধাকর* (১৮৯৫), মাসিক *হাফেজ* (১৮৯৭), মাসিক *কোহিনুর* (১৮৯৮), মাসিক *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯৯) — এসব পত্রিকায় মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ, উন্নতির উপায় সন্ধান, কংগ্রেসে অধিক সংখ্যায় যোগদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানানো এবং প্রতিবেশী মুসলমানরা আঘাত পায় এমন কিছু না লিখতে ও না করতে কৃতবিদ্য হিন্দুদের অনুনয়-অনুরোধ করা হয়েছে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত মাসিক *নবনূর*-কে বাঙালি মুসলমানের প্রথম যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা বলা যায়। এই পত্রিকারই ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যায় (১৯০৪) প্রকাশিত হয় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের বিস্ফোরক প্রবন্ধ 'আমাদের অবনতি', যার বৈপ্লবিক ধ্বনি আজও আমাদের কানে অনুরণিত হয়।[১]

বাঙালি মুসলমানের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংগঠন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে, কলকাতায়। সাত বছর পর ১৯১৮ সালে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। রুচি ও সমৃদ্ধি দুদিক থেকেই এটি শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একই বছরে প্রকাশিত হয় মাসিক *সওগাত*। বছর চারেক চলার পর বন্ধ হয়ে গিয়ে ১৯২৬ সালে নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়ে এটি দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে। নবপর্যায়ের *সওগাত* মুসলিম সমাজে চিন্তার জাগরণ ও লালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আরও বেশি ভূমিকা রাখে একই সম্পাদকের সাপ্তাহিক *সওগাত* (১৯২৮)। নজরুল ইসলাম অনেকদিন এই সাপ্তাহিকে চাকরি করেছিলেন। মাসিক *আল-এসলাম* (১৯১৫), মাসিক *মোহাম্মাদী* (১৯২৭), অর্ধ-সাপ্তাহিক *ধূমকেতু* (১৯২২), মাসিক *নওরোজ* (১৯২৭), মাসিক *তরুণপত্র* (১৯২৫), মাসিক *জাগরণ* (১৯২৮), মাসিক *জয়তী* (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকার অবদানও খুবই স্মরণীয়। এগুলোর মধ্যে *আল-এসলাম* ও *মোহাম্মদী* ছিল রক্ষণশীল ধারার পত্রিকা। তা সত্ত্বেও কখনো কখনো এদের প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতেও দেখা যায়। যেমন *মোহাম্মদী*-র সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ 'সমস্যা ও সমাধান' শিরোনামে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ব্যাংকিং সুদ ইত্যাদি যে ইসলাম ধর্মে না-জায়েজ বা অবৈধ নয়, তা প্রচুর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে এই পত্রিকায় কয়েক কিস্তি জুড়ে আলোচনা করেছিলেন।

বোধ করি সব দেশ-কালেই রবীন্দ্রনাথ-কথিত ইতিহাস-বিধাতা কখনো কখনো একটু বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় এই রকম একটা

অবস্থাই লক্ষ করি। কথিত ইতিহাস-বিধাতা উনিশ শতকের প্রথমে ঘা মেরেছে নিঃসাড় হিন্দু বাঙালির চেতনায়, আর বিশ শতকে মুসলমান বাঙালির চেতনায়। ইতিহাস-বিধাতা মানে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির জন্ম-সম্ভাবনায় কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি মুসলিম জাগরণে সবচেয়ে উত্তুঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছে বিশ শতকের যে-বিশের দশকে, তা একই সঙ্গে ঘটেছে কলকাতা ও ঢাকা — বাংলার এই দুই প্রধান শহরে। নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায়, ১৯২৬ ও ১৯২৮ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে মাসিক ও সাপ্তাহিক *সওগাত*। মাসিকের টাইটেল পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হচ্ছে নারী-জাগরণের এই উদ্দীপক বাণী : 'নারী না জাগলে জাতি জাগবে না।' সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ছাপা হচ্ছে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি। এখানেই থামছেন না সম্পাদক। কেবল মেয়েদের লেখা নিয়ে তাঁদের ছবিসহ প্রকাশ করছেন মহিলা *সওগাত* বিশেষ সংখ্যা। মুসলিম সমাজে এসব তখন কেবল অভিনব নয়, অভাবিত। প্রতি সন্ধ্যায় ১১ নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রিটের *সওগাত* অফিসে সাহিত্যের আড্ডা বসছে। সেখানে জড়ো হচ্ছেন এক ঝাঁক মেধাবী মুসলিম তরুণ। তাঁদের মধ্যমণি নজরুল ইসলাম। এঁদের প্রায় সকলেরই বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তাঁদেরই ভাষায় তাঁদের মাথায় 'গজগজ' করছে নতুন নতুন চিন্তা ও তা প্রকাশের ব্যাকুলতা। সাপ্তাহিক *সওগাত*-কে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। *সওগাত*-সংশ্লিষ্টরা রক্ষণশীল বিরোধীদের কাছে পেয়েছেন 'সওগাতী দল'—এই বিদ্রূপাত্মক পরিচিতি।

এদিকে ঢাকার তরুণদের মাথায়ও নতুন চিন্তা আলোড়িত হচ্ছে। সে-সব চিন্তার কিছু কিছু ছিল যথেষ্ট বিস্ফোরণমূলক। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরুর সাড়ে চার বছরের মাথায় ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে সংগঠন। নামে সাহিত্য-সমাজ হলেও সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চিন্তাচর্চা। *শিখা* তাদের বার্ষিক মুখপত্রের নাম। এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে রক্ষণশীলেরা বিদ্রূপ করে বলতেন 'শিখা গোষ্ঠী'। নামটি পরবর্তীকালে শাপে বর পেয়েছে। কেননা এখন সদর্থকভাবেই তাদের 'শিখা গোষ্ঠী' বলে পরিচয় দেওয়া হয়। *শিখা*-র টাইটেল পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকত সংগঠনের চিন্তা-দর্শনের সার-বাণী : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' কথাটির যৌক্তিক পরম্পরা ও পরিণতি লক্ষণীয়। জ্ঞান থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মুক্তি। এজন্য শিখা গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ডের নাম দিয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। উল্লেখ্য যে, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রগতিমুখী সংঘবদ্ধ আন্দোলন মুসলিম-বিশ্বের আর কোথাও অদ্যাবধি হয়নি।

দুই

শিখা গোষ্ঠী-কথিত মুক্তির এষণা অন্তরে ধারণ করেই পূর্বাপর মুসলিম চিন্তকেরা সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, নারীমুক্তি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের রেনেসাঁসধর্মী চিন্তার স্বাক্ষর রখেছেন। এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত জানা তথ্য মোতাবেক প্রথম যাঁর নাম পাওয়া গেছে, তিনি দেলোয়ার হোসেন আহমদ মির্যা (১৮৪০–১৯১৩)। তাঁর জীবন

সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ১৮৬১ সালে বি.এ-তে প্রথম শ্রেণি পাওয়া দেলোয়ার হোসেন কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন আধুনিকমুখী ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রথম পথিকৃৎ। ১৮৮৯ সালে কলকাতা থেকে দু'খণ্ডে *Essays on Muhammadan Social Reform* নামে তাঁর পুস্তক বেরিয়েছিল। এতে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, গোটা মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে তাদের জাগতিক আইনকে ইসলামের ধর্মীয় আইন থেকে পৃথক করা। (সালাহ্উদ্দীন, ১৯৯২ : ৮৪) নিজে বাংলায় কিছু না লিখলেও তিনি এই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ, সাহিত্যচর্চা ও উন্নতমানের ইংরেজি বই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (দ্র. অতীন, ২০১১ : ২৬-৩০) ইংরেজি ভাষায় লেখার ফলে তাঁর চিন্তা-চেতনা বাঙালি মুসলমান সমাজে তেমন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এমন প্রমাণ মেলে না। তবে এটা খুবই সত্য যে, তাঁর জীবনদৃষ্টিতে বৈপ্লবিক উপাদান যথেষ্ট ছিল। পরবর্তী মুসলিম ভাবুকদের চিন্তাধারা মুখ্যত ওই একই খাত ধরে এগিয়েছে। আর সেটি হচ্ছে জাগতিক প্রতিটি সমস্যাকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখা।

মুসলমান সমাজে উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় : ধর্মের নামে শাসন-শোষণ, আশরাফ-আতরাফ ভেদ, নারীকেন্দ্রিক সমস্যা, ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মবিরোধী ভাবা, আর্থিক উন্নতিতে উদ্যোগহীনতা, মাতৃভাষার মূল্য না দেওয়া, রাজনীতি সম্পর্কে অসচেতনতা, সঙ্গীত-নাটক-চিত্রকলা-অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

ইসলামে পুরোহিত-ব্যবস্থা না থাকলেও ভারতের, বিশেষত বাংলার, মুসলমান সমাজে পির ও মওলানা-মোল্লার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। এরা প্রায় গোটা সমাজকে জীবন ও জগৎ-বিমুখ করে রেখেছিলেন। মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবন করেছিলেন এদের প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে উন্নতি লাভ সম্ভব হবে না। এদের কাজই ছিল কতকগুলো 'বাঁধা বুলি' শুনিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। (দ্র. হবিবর, ১৯৩৪ : ৪৯-৫০) সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল। এমনকি ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় লীগ এগেন্স্ট্ মোল্লাইজম বা মোল্লাকি নিবারণী সংঘ নামে সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদিও সংঘের কর্ম তৎপরতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। (হাবিব, ২০১২ : ৭৬)

নারীর প্রতি ধর্মবিরোধী ও অমানবিক আচরণ ছিল এই সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা। ইসলামে নারীর যতটুকু মূল্য দেওয়া হয়েছে তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তাদের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন চালানো হতো। তাদেরকে অবরোধ ও পর্দার মধ্যে রেখে, শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, খুশিমতো বিয়ে করে ও তালাক দিয়ে, তথাকথিত উঁচু সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না করে সামাজিক অগ্রগতির পথ রোধ করা হয়েছিল। এসব সমস্যার বিরুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি সংখ্যায় স্বল্প হলেও মেয়েরাও যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছিলেন। ধর্মীয় ও বিশুদ্ধ মানবিক — দুদিক থেকেই তাঁরা তাঁদের যুক্তি আহরণ করেছিলেন।

অবরোধ প্রথা সম্পর্কে আমিনা খাতুন নামে একজন লেখিকা বলেন যে, 'অত্যাচারমূলক পর্দা' পুরুষের নিজের গড়া হাদিসে থাকতে পারে কিন্তু কোরান ও রসুলের হাদিসে নেই। (আমিনা, ১৩৩৫ : ৩৫৯) নারীমুক্তির অগ্রদূত অভিধাপ্রাপ্ত রোকেয়া লিখেছিলেন, 'পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন হওয়া বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি — কেবল অন্তঃপুরের চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে।'[২] কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বাস্তবতার আলোকেও বিষয়টিকে বিচার করা হয়েছিল। যেসব মোল্লা-মৌলবি ফতোয়া দেন যে, মুসলিম মেয়েদের পর্দার মধ্যে থাকা ধর্মীয় নির্দেশ, তাদের প্রতি এমন মোক্ষম প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, দরিদ্র ও শ্রমজীবী মেয়েরা ওই নির্দেশ মানলে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে কী করে? বলা বাহুল্য এ জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর নেই।

মুসলিম নারীর জীবনে বিয়ে নামক ব্যাপারটি বোধকরি সবচেয়ে বেশি সংকট সৃষ্টি করেছিল। বাল্য বিয়ে, একাধিক বিয়ে, বিধবা বিয়ে, বিয়েতে পণ, স্ত্রী-ত্যাগে স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের জীবনকে নিগ্রহের যাঁতাকলে পিষ্ট করেছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল লেখক নারী-মুক্তির লক্ষ্যে সমস্যাগুলোর নিরসন কামনা করেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন মতামতের সপক্ষেও লেখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল পাত্র-পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে 'পরস্পর মনোনয়ন' করে যে-বিয়ে করে সে-বিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও ইসলাম অনুমোদিত। (সিরাজী, ১৩২৬) একজন লেখিকা এমন কথাও লিখেছিলেন, কন্যাকে অপাত্রে বা কুপাত্রে অর্পণ করে তার জীবনব্যাপী দুঃখ সৃষ্টি না করে তাকে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত। (আয়েশা, ১৩৩৬)

মুসলিম সমাজের সার্বিক দুরবস্থার মূল কারণ ছিল যুগোপযোগী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি বিদ্যা সময়মতো গ্রহণ না করা। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তুলনায় প্রায় পৌনে একশ বছর পর কেন তারা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন তার বহুবিধ কারণ আছে। এখানে তা আমাদের আলোচ্য নয়। সাধারণভাবে শিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার যুক্তিধারা দেখানোই এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট। বলা দরকার, ইংরেজি শিক্ষা-বিরোধী গোঁড়ারা সমাজে আগেও ছিলেন, পরেও ছিলেন। তাহলেও *ইসলাম-প্রচারক*-এর মতো মধ্যপন্থী পত্রিকার বক্তব্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, সমাজ-মানসে একটা পরিবর্তন ঘটছে। ওই পত্রিকায় লেখা হয় :

> ইংরাজই বোধহয় সর্বপ্রথম এদেশে সর্বশ্রেণির মধ্যে বিদ্যালোচনার পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান এ বিষয়ে প্রথম হইতে ঔদাসীন্য দেখাইয়া আপন পায়ে কুঠার মারিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের পরবর্তীগণ ইংরাজী শিক্ষায় অমনোযোগী হওয়ায় ক্রমে ক্রমে আপন অধিকার হইতে তাড়িত হইয়াছেন। ...ইংরাজি শিক্ষায় ঔদাসীন্য বশত আমরা ইংরাজ রাজত্বের রাজনীতি অধিকার হইতে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছি। (আফতাব উদ্দীন, ১৩১১)

ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করার পর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সমাজে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে অনিবার্য হয়ে পড়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষা-

বিতর্ক। মাদ্রাসা শিক্ষা একান্তভাবে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ইসলামের শাস্ত্রাদি আরবি ভাষায় লিখিত হওয়ার কারণে মাদ্রাসা-শিক্ষার মাধ্যম আরবি হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু কলকাতা মাদ্রাসাসহ দেশের সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু অথবা ফারসি কিংবা দুইই। একটি বিদেশি ভাষার বিষয় পড়ানো হতো অন্য একটি বা দুটি বিদেশি ভাষায়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল অষ্টাবক্র অবস্থার মতো। এ শিক্ষা সমাজের কল্যাণে কোনো কাজে আসছিল না। প্রগতিশীল মুসলিম চিন্তকেরা সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। খানবাহাদুর নাসিরুদ্দীন গোটা মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেন। (নাসিরুদ্দীন, ১৯৩০) সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজী মোতাহার হোসেন ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে তা দেশের জন্য কল্যাণকর নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন। (মোতাহার, ১৯৩০ : ৫১-৫২) এজন্য একজন লেখক অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, '...মুসলিম শিক্ষা প্রণালীর সংশোধন করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষায় আরবি পার্শী উর্দু বিজাতীয় ভাষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া এবং নতুন পুরাতন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।' (মমতাজুদ্দীন, ১৩৩৩)

মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্যে যিনি প্রথম প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। ১৮৮৩ সালে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় তিনি একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর বিশ শতকের গোড়ায় নারী শিক্ষার অদম্য উৎসাহ নিয়ে কলকাতায় আবির্ভাব ঘটে রোকেয়ার। ১৯১১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। নারী শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে আসেন প্রগতিশীল পুরুষেরাও। তবে বিতর্ক ছিল মেয়েদের শিক্ষার ধরন ও লক্ষ্য নিয়ে। তাহলেও দিন বদলের সাথে মুসলিম মেয়েরা স্কুল-কলেজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।

শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ তা মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বাস্তবতার কঠিন আঘাতে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য সততা বজায় রেখে যে-কোনো সম্মানজনক পেশা গ্রহণের তাগিদ তারা দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে চিন্তাশীল নারীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। আয়েশা আহমদ তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, নারী ভদ্রভাবে উপার্জনক্ষম হলে আর্থিক সমস্যারও সমাধান হয় (*সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬)। নারীমুক্তির প্রশ্নে রোকেয়া তো মেয়েদের স্বাধীন ব্যবসার কথাও বলেছিলেন। (রোকেয়া, ২০০৬ : ২৯-৩০)

সমাজের জাগরণ ও উন্নতির জন্য মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব মুসলিম লেখকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মতভেদ ঘটেছিল সেই ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি বা ধরন নিয়ে। একদল চাইতেন ইসলামি বা মুসলিম সাহিত্য। ভাষাগত দিক থেকেও তারা অধিক পরিমাণে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্যের শিল্পগত মান নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ইসলামি বা মুসলিম সাহিত্য বলতে কী তারা বোঝাতে চান তা স্পষ্ট করতে পারেননি। অন্যদিকে স্বচ্ছ দৃষ্টির

অধিকারী যুক্তিপন্থীরা ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সর্বজনীন মনোভঙ্গি দ্বারা চালিত ছিলেন। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিতেন। কোনো লেবেল-লাগানো সাহিত্যেও তাদের আস্থা ছিল না। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন, '...যাহারা ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠির দ্বারা কাব্য যাচাই করিতে যান, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাহাদের কাব্য-সমালোচনা সুন্দর হয় না, সত্য হয় না, অত্যন্ত উদ্ভট হইয়া উঠে।' (শামসুদ্দীন, ১৩৩৩)

সুদীর্ঘ কাল পাশাপাশি বাস করার ফলে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একদিকে যেমন প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে অন্যদিকে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। যাত্রা, কবিগান, মেলা, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিছক আনন্দ উপযোগ ছাড়াও উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানিক কিছু সম্পর্কও ছিল এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নির্দ্বিধায় পরস্পরের অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। উনিশ শতকে মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুসলমানদের নিষেধ করে এবং যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ওপর কাফেরি ফতোয়া জারি করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকে বলে রক্ষণশীল গোঁড়াদের বিধি-নিষেধ বহু ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে।

শিল্প উপভোগের মতো শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষাও মানুষের সহজাত। পাপের ভয় দেখিয়ে কিংবা চোখ রাঙিয়ে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তা যায়নি। উনিশ শতকের মুসলিম ধর্ম-সংস্কারকেরা যা-ই বলুন না কেন, ভারতীয় সঙ্গীতে এই সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করা যায়নি। বাংলায় কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন আহমদের প্রতিভা হয়ে ওঠে বাঙালি মুসলমানের পরম গর্বের। তেমনি চিত্রকলায় জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম. সুলতান প্রমুখ শিল্পী দেশে-বিদেশে বরমাল্য পান। নাটক রচনা ও অভিনয়ে আলোচ্য কালপর্বে বাঙালি মুসলমান উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু এই দুই শিল্প সম্পর্কে মুক্তদৃষ্টির লেখকদের মনোভাব বোঝা যাবে এই উক্তিতে : '....ধর্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।' (সালাম, ১৩৩৩)

মুসলিম চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অবদান সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া সহজ নয়। এখানে আমরা একটিমাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি যা থেকে এদের মানসদৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। 'সাহিত্য-সমাজের' ৫ম বর্ষের ১ম সাধারণ অধিবেশনে হজরত মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ পড়া হয়। আলোচনা পর্বে সংগঠনের 'ভাবযোগী' ও 'কর্মযোগী' বলে অভিহিত কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন যা বলেন তার সারাৎসার এরকম : মুহম্মদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে বিচার করতে যাওয়ায় আজকের মুসলমানদের কোনো লাভ নেই। অর্থাৎ আজকে এগুলো বড় সমস্যা নয়। আজকে তাঁকে দেখতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে। ইতিহাসের এক অতীত যুগে ভিন্ন আবেষ্টনে বাস করে তিনি যে-জীবন যাপন করেছেন, যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তার

থেকে আজকের দেশ-কালে যেটুকু উপযোগী, মুসলমানদের শুধু সেটুকুই নিতে হবে। (হাবিব, ২০০৯ : ১০৯)

ধর্মশাস্ত্রের কথিত চিরন্তনতা ও অপরিবর্তনীয়তা নীতির ক্ষেত্রে এই উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিঃসন্দেহে রেনেসাঁসের স্পিরিট বা মর্মবাণী নিহিত আছে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে রেনেসাঁস-বিশেষজ্ঞ বাঙালি মনীষীরা বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁস-ই বলেছেন। অন্নদাশংকর রায় একে অভিহিত করেছেন বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁস বলে। (অন্নদাশংকর, ১৯৯৩ : ৩০৭) সংগঠনের লেখকেরাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশেষ কোনো সাফল্য ছাড়াই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। এর পেছনে গুরুতর যে-কারণটি সক্রিয় ছিল তাকে সংগঠনের অন্যতম লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী চিহ্নিত করে লিখেছেন, 'এর আরব্ধ কাজ শেষ হতে পারেনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে।' (মোতাহের, ১৯৭০ : ৬৯) এই ক্ষুদ্র বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মানে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব। রাজনীতিতে ধর্ম এসে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। পরিণাম যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। ফল হচ্ছে উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালির দুটি নবজাগরণকে তাদের আরব্ধ কাজ শেষ করতে দেওয়া হয়নি। দিলে বাংলার ইতিহাস অন্যরকম হতো।

টীকা

১. ১৯০৭ সালে *মতিচূর* ১ম খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় রোকেয়া লেখাটির নামকরণ করেন 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। তাছাড়া মূল রচনার ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়ে সেখানে সাতটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। বর্জিত অংশে ধর্মগ্রন্থের ঐশিতা প্রকারান্তরে অস্বীকারসহ কিছু যৌক্তিক ও বিস্ফোরক উক্তি ছিল। ধারণা হয়, রোকেয়া তাঁর স্বপ্নের স্কুলটি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমাজের সঙ্গে আপসের নিমিত্তে অনুচ্ছেদগুলো বর্জন করেছিলেন। বর্জিত অংশগুলো পাওয়া যাবে আবদুল কাদির সম্পাদিত *রোকেয়া রচনাবলী*-র ভূমিকাংশে (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৬) এবং আমার *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব* গ্রন্থে (কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২), পৃ. ২২-২৩

২. 'বোরকা', মতিচূর (১ম খণ্ড), *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ৪২। পর্দাবিরোধীদের সবাই পর্দা বলতে সুরুচি-শালীনতার কথাই বুঝিয়েছিলেন।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অতীন ভট্টাচার্য (২০১১)। 'দিলওয়ার হোসেন মির্জার মানসে বাংলার মুসলমান'; *উনিশ-বিশ শতক : টুকরো ইতিহাস মননের আলোকে*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

অন্নদাশংকর রায় (১৯৯৩)। 'বাংলার রেনসোঁস'; *প্রবন্ধসমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

আবদুস সালাম খাঁ (১৩৩৩)। 'নাট্যভিনয় ও মুসলমান সমাজ', *শিখা*, ১ম বর্ষ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৩৩৩)। 'কাব্য-সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান', *সওগাত*, পৌষ সংখ্যা। [উদ্ধৃত : হাবিব রহমান, ২০১২ : ১১৬-১৮]

আমিনা খাতুন (১৩৩৫)। 'পর্দা ও ইসলাম', *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র সংখ্যা।

আয়েশা আহমদ (১৩৩৬)। 'মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়', *মাসিক সওগাত*, ভদ্র সংখ্যা। [উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭, পৃ. ৭৭]

এম আফতাব উদ্দিন আহমদ (১৩১১)। 'বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা', *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ সংখ্যা। [উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৭৭ : ৬-৭]

কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৩০)। 'ধর্ম ও শিক্ষা', *শিখা*, ৪র্থ বর্ষ।

নাসিরুদ্দীন আহমদ (খানবাহাদুর) (১৯৩০)। 'ইসলাম ও মুসলমান', মুসলিম সাহিত্য সমাজের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ। [উদ্ধৃত : হাবিব রহমান, *মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ*, বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ৯০]

বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৪)। *সংস্কৃতির সংকট*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ।

মমতাজুদ্দীন আহমদ (১৩৩৩)। 'শিক্ষা সমস্যা', *শিখা*, ১ম বর্ষ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) (১৯৭৭)। সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯৭০)। 'রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী', *সংস্কৃতি-কথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

শেখ হবিবর রহমান (১৯৩৪)। *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ*, মুখদুমী লাইব্রেরি, কলকাতা।

সালাহউদ্দীন আহমদ (১৯৯২)। 'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা', *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সিরাজী (ইসমাইল হোসেন) (১৩২৬)। 'বিবাহ-নীতি', *আল-এসলাম*, কার্তিক সংখ্যা। [উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৭৭ : ৭৮-৭৯]

হাবিব রহমান (২০০৯)। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস ও চিন্তা-দর্শন', *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন*, মিএম, কলকাতা।

(২০১২)। *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।